9:05 p.m.
drive.google.com

দেখত। একদিন হঠাৎ মাহাতো গাঁয়ের একটা ছেলে নেংটি পরা চেহারা নিয়ে কাঁটাতার থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে দেখছে আমেরিকান সোলজারদের। সৈনিকদের একজন ছেলেটার উদ্দেশ্যে উঁচুগলায় শব্দ করলে ছেলেটা গাঁয়ের দিকে ছুটে পালাল। কিন্তু আর একদিন ট্রেন থামলে আবার সেই ছেলেটা কাঁটাতারের ওপারে এসে দাঁড়াল সাহসে ভর করে। সে একা নয়; আর একটি একটু বড়ো তাবিজ গলায় ছেলেও দেখছে সৈন্যদের। তাদের নেংটি পরা রোগা শীর্ণ শরীর, কালো গায়ের রঙ, রুক্ষ চেহারা দেখে একজন সৈনিক কফিতে চুমুক দিতে দিতে আর একজনকে বলল 'অফুল'। ছেলেদুটো কথার মানে বোঝেনি; তারা তাকিয়ে দেখেছে মানুষগুলিকে। ক্রমে ক্রমে মাঠের কাজ ফেলে ছেলেদুটো ছাড়াও বছর পনেরোর একটি মেয়ে, দুজন মাহাতো পুরুষ এসে দাঁড়াল। ট্রেন চলে যাবার পর তারাও হাসতে হাসতে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে করতে গাঁয়ের দিকে চলে গেল। যাদের খেতের কাজ ছেড়ে কোথাও নড়বার অবসর নেই, তারাই এখন মিলিটারি ট্রেন এসে দাঁড়ালে সবকাজ ছেড়ে ছুটে আসে কাঁটাতারের ধারে। এখন একজন, দুজন, পাঁচজন নয়। দলে দলে সারি দিয়ে কাঁটাতারের ধারে দাঁড়ায়। এভাবেই বদলে গেল গ্রামীণ মানুষগুলির অনেক কিছু। অর্ধনগ্ন, রিক্ত শীর্ণ কৃষ্ণাঙ্গ মানুষগুলোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ইয়াঙ্কি বর্ণ-গৌরব নিয়ে দাম্ভিক অহঙ্কারে সৈন্যদের কেউ কেউ করুণা ছুঁড়ে দিল কাঁটাতারের ওপারের মানুষগুলির উদ্দেশ্যে। চকচকে আধুলিটা দেখে মাহাতোরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করত লাগল। কিন্তু তারা আধুলিটা হাতে তুলে নেয় নি। ঠিকাদার কথকই মাহাতো বুড়োর হাতে আধুলি তুলে দিলেন। এরপর ট্রেন এসে দাঁড়ালেই গ্রামের ছেলেবুড়ো মেয়ে সবাই কাঁটাতারের ওপারে ভিড় করত। সমস্বরে বলত 'সাব বর্কাশিস্ বকশিস্।' আর আমেরিকান সৈনিকরা তাদের উদ্দেশ্যে মুঠো মুঠো আনি, দুয়ানি ছুঁড়ে দিত। ওরা হুমড়ি খেয়ে পয়সাগুলো কুড়োতো। কাঁটাতারে হাত পা ছড়ে যেত; কারোর কারোর নেংটি কাপড় তারে লেগে ফেঁসে যেত। একমাত্র মাহাতো বুড়ো আসত না। সে খেতে মাটি কোপাত অথবা গাঁয়ের ছেলেবুড়োদের পয়সা নেওয়ার জন্য ধমক দিত।

বিদেশী সৈনিকদের কাছে নিজের দেশের মানুষের এই ভিক্ষাবৃত্তি; এই কাঙালপনা প্রকাশ করতে দেখে ঠিকাদার কথক ক্ষুব্ধ হতেন। আমেরিকান অফিসার যেদিন 'অফুল' বলেছিল সেদিনও ঠিকাদার ব্যথিত হয়েছিলেন। যতবার সৈন্যরা পয়সা ছুঁড়ে দিত ততবারই ঠিকাদার কথক নিজের দেশের মানুষের হীনম্মন্যতায় লজ্জিত হতেন। আবার মনেমনে মাহাতোবুড়োর ব্যতিক্রমী আচরণের জন্য গর্ব হতো। কারণ মাহাতো বুড়ো ক্ষেতের কাজ ফেলে এসে ভিক্ষা চায়নি। যেদিন অফিসার কালো দীন দরিদ্র মাহাতোগাঁয়ের মানুষগুলিকে 'ব্লাডি বেগার্স' বলে কটাক্ষ করল সেদিন জানকীনাথ ও কথক অপমানে মাথা তুলে তাকাতে পারলেন না। ট্রেন চলে যেতেই ভগোতীলালকে নিয়ে ওদের উদ্দেশ্যে তেড়ে গেলেন। দেশীয় মানুষের বিদেশীর কাছে হীনবৃত্তি প্রকাশ অসহ্য মনে হয়েছিল তাঁদের। কিন্তু মাহাতো গাঁয়ের ছেলেমেয়ে বুড়ো হাসতে হাসতে কুড়নো পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে গাঁয়ের দিকে চলে গেল। সজীব মাটির মতো সরল মানুষগুলির হীনপরিবর্তনে কথক অপমানিত বেদনার্ত হলেন।

ঠিকাদার কথকের কাছে মাহাতো বুড়োর আচরণ ছিল গর্বের বিষয়। একা মাহাতো

4G 44% 9:06 p.m.
drive.google.com

একজন, দুজন করে অনেকজনের মাহাতো ছেলে মেয়ে, নারীপুরুষের ভিড়; তাদের উদ্দেশ্যে ইয়াঙ্কি সৈন্যদের হাসি বিদ্রূপ, করুণা ছুঁড়ে দেওয়া, ধীরে ধীরে দ্বিধা কাটিয়ে মাহাতো দীন মানুষগুলির দান গ্রহণ ও ভিক্ষার আবেদন-এমনি খণ্ডখণ্ড অংশের সংযোজনে Pieces of artistic organisation গড়ে তুলেছেন লেখক। আর চূড়ান্তে এসে চলন্ত ট্রেনের সৈনিকদের কাছে 'বখশিস্ বখশিস্' বলে সকলের সঙ্গে স্বাধীন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মাহাতো বুড়োর স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে স্বর মেলানো মর্মবিদারী ট্র্যাজিক বেদনা জাগিয়েছে। তখনই ছোটগল্পের চূড়ান্ত শিল্প সার্থকতা ঘটেছে। বিন্দুর মধ্যে যেন সিন্ধুদর্শন করালেন লেখক। গল্পটি প্রতীকতা লাভ করল। তখন এ গল্প শুধু ভারতবর্ষের কোনো এক অখ্যাত পাণ্ডববর্জিত স্থান ও মুষ্টিমেয় মাহাতো মানুষজনের তাৎক্ষণিক ক্ষয় ও পতন এবং বিচ্যুতির গল্প হয়ে থাকল না। গল্পের এই চূড়ান্ত পরিণতিতে উঠে এল গোটা ভারতবর্ষের অমোঘ অনিবার্য নিয়তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাতাবরণকে অবলম্বন করে ছোটগল্পের সীমিত পাত্রে ভারতবর্ষের সামগ্রিক সামাজিক সঙ্কট ও পরিণতিকে ছোটগল্পকার তাঁর সুগভীর ইতিহাসবোধ ও দেশপ্রেমের অন্তরঙ্গ নির্জন কণ্ঠস্বরে সার্বিক বেদনা রূপে প্রকাশ করলেন। মাহাতো বুড়ো যে মানবিক আদর্শ ও মূল্যবোধ আঁকড়ে অস্তিত্বের গৌরব ঘোষণা করে ঠিকাদার কথকের নৈতিক অবলম্বনকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সেও যখন ভিখারিতে পরিণত হল তখন অস্তিত্ব হারানোর যন্ত্রণা অপমান ছাড়া ভারতবর্ষের মানুষের আর কিছুই টিঁকে থাকল না—এই মর্মভেদী নিরুচ্চার বেদনা পাঠককে আবিষ্ট করে রাখে। ঠিকাদার কথকের বাচনে নির্মম সত্য উচ্চারিত হয়—'আমরা জানতাম ট্রেন আর থামবে না। ট্রেনটা চলে গেল। কিন্তু মাহাতো-গাঁয়ের সবাই ভিখারী হয়ে গেল। ক্ষেতিতে চাষ করা মানুষগুলো সবাই ভিখিরী হয়ে গেল।' এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি আর সুগভীর নির্জন কণ্ঠস্বর যাকে 'The lonely voice' বলা হয়েছে সেটাই গল্পের অন্তিমবাক্যে ব্যঞ্জনা প্রতীকতায় অখণ্ডতাবোধ জাগিয়েছে। মার্জিত গদ্যময় বাস্তবতায় একটা জাতির, একটা গোটাদেশের মনুষ্যত্ব বিকিয়ে যাওয়ার যন্ত্রণার আর্ত মৌন ক্রন্দন অসামান্য বক্তব্য ও উপস্থাপনায় শিল্প সার্থক হয়েছে।

4G 44% 9:05 p.m.
drive.google.com
গল্পচর্চা.pdf
Sign in

ভারতবর্ষ : সভ্যতার সংকট

স্বস্তি মণ্ডল

বিংশ শতাব্দীর উত্তরসাতচল্লিশে যাঁরা ছোটগল্প লিখে পাঠকের মনে বিস্ময় জাগিয়েছেন, রমাপদ চৌধুরী এঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্প 'ভারতবর্ষ', 'গতযুদ্ধের ইতিহাস' 'তিতির কান্নার মাঠ', 'মানুষ-অমানুষের গল্প', 'ইমলী', 'ব্রীজ', 'বড়বাজার' এরকম বেশ কিছু গল্পের নাম করা যায়। প্রথম গল্প লেখেন ছাত্রজীবনে প্রেসিডেন্সিতে পড়বার সময়। গল্পটির নাম 'ট্র্যাজেডি'। ওয়াই এম. সি.এ. রেস্তোরাঁয় বসে গল্পটি লেখেন এবং 'আজকাল' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ছাপা হয়। 'দেশে' প্রকাশিত প্রথম গল্প 'তিতির কান্নার মাঠ।' রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম গল্প 'বারোঘোড়ার আস্তাবল'; পরে নামবদলে রাখেন 'শাস্তা'। গল্প উপন্যাস দুইই কম লেখেন। নিজে প্রচারবিমুখ। আজ পর্যন্ত তাঁর লেখালিখির সংখ্যা খুবই কম। নিজে মিতবাক; লেখা-লিখির ক্ষেত্রেও মিত সংযমী এক বিশিষ্ট লেখক।

'ভারতবর্ষ' গল্পটি রমাপদ চৌধুরীর প্রতিনিধিস্থানীয় গল্প। এটির প্রকাশকাল ১৯৬৮। গল্পটি অনুবাদ করেছিলেন ক্লিন্টন বি.সিলি। গল্পটি আমেরিকা থেকে প্রকাশিত লিটারারি ওলিম্পিয়ানস্ গ্রন্থে স্থান পায়। এ গল্পটি ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির গল্প। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পট এর রচনার কেন্দ্রীয় সময়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগ্রাসী নীতি, লোভ, কালোবাজারী, মূল্যবোধহীনতা নিয়ে লেখা গল্পের ছক এখানে ব্যবহৃত হয়নি। অন্তর্মুখী স্বভাবের ছোটগল্পকার রমাপদ চৌধুরী তাকিয়েছেন ব্যক্তি ও সমাজের গভীর মর্মমূলে। একটা যুদ্ধের অভিঘাতে ঔপনিবেশিক জীবনধারা কিভাবে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যায়; নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে তার সতর্ক অনুসন্ধান করেছেন গল্পকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রায় দুদশক পরে লেখা এই গল্পে স্বাভাবিক ভাবেই নির্মোহ আবেগ আঁকা নিখুঁত বীক্ষার স্বাক্ষর সহায়ক হয়েছে। এই বীক্ষা থেকেই স্পষ্ট হয়েছে লেখকের ইতিহাসবোধ, জাতীয়তাবোধ। গল্পের শেষবাক্য মর্মন্তুদ আত্মযন্ত্রণাজাত বেদনাকেই বাঙ্ময় করে তুলেছে—

'ট্রেনটা চলে গেল। কিন্তু মাহাতোগাঁয়ের সবাই ভিখারি হয়ে গেল। ক্ষেতিতে চাষ করা মানুষগুলো সব-সব ভিখারি হয়ে গেল।'

অস্তিত্বকে হারিয়ে ভিখারিতে পরিণত হলো শুধু মাহাতো গাঁ নয়; যেন একটা গোটা দেশই এই সংকটের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের আত্মসম্মান হারানোর গল্প এটি। ভাবতে অবাক লাগে স্বাধীনভারতবর্ষে ষাটের দশকের প্রান্তে এসে জাতীয় জীবনের নিদারুণ হতাশা দেখে বিমর্ষ সংবেদনশীল গল্পকার এরকম একটি গল্প লিখলেন। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর দুটিদশকে চারপাশের সামগ্রিক বঞ্চনা, হতাশা, বিক্ষোভ, বেকারত্ব লেখককে এতটাই আলোড়িত করেছিল যে তিনি এমন এক মানবিক অপচয়ের গল্প লিখতে পারলেন।

যে সময়ে দাঁড়িয়ে গল্প লিখছেন সেই সময়ের বেদনার্ত স্পন্দন তাঁকে অনুসন্ধানী

Page 1,007 / 1,128

4G 44% 9:06 p.m.
drive.google.com

প্রকৃত অসহায়তা। ঠিকাদারের ভারতবর্ষ সর্বদা সন্ত্রস্ত বিদেশী শাসকশ্রেণীর কাছ থেকে ও. কে. সার্টিফিকেট জোগাড় করে নিজের ঠিকাদারী বা কন্ট্রাক্টকে কায়েমী করে রাখতে ব্যস্ত অন্যদিকে অগণিত নেংটি পড়া রুক্ষচুল ভয়মিশ্রিত কৌতূহলীর দৃষ্টিতে আর এক ভারতবর্ষ থমকে আছে। সুযোগ পেলেই বখশিস্ বখশিস্ করে নিজেদের দীনতা নগ্নতাকে হাসতে হাসতে মেলে ধরে এরা। স্বজাতির এই ভিক্ষাবৃত্তির হীনতা যে ঔপনিবেশিকতা মুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষেও অব্যাহত আছে সেটা গল্পটি পড়লেই বোঝা যায়। সার্বিক অবক্ষয় যে ভারতবাসীকে গ্রাস করে রেখেছে সেটাই শাণিতব্যঙ্গে প্রকাশ করেছেন। যুদ্ধশেষ চারিদিকে মুক্তির বার্তা। তবুও মানুষগুলি ভিক্ষুক রয়ে গেল—এটাই উপনিবেশবাদের মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডি। মুষ্টিমেয় ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ, অগণিত সাধারণ মানুষের ভারতবর্ষ সব একাকার হয়ে গিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শোষকশক্তির অবজ্ঞাভরা করুণার দান দুএকটি সিকি আধুলি ছুঁড়ে দেওয়া ও সেই দাক্ষিণ্য পাবার জন্য কাঁটাতারের ওপারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকার ঘটনায়। 'ভারতবর্ষ' নামটি এই কারণেই প্রতীকতা লাভ করেছে। মাহাতোগাঁয়ের সমবেত মানুষগুলিও খেতকাজ হারিয়ে ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে। তারাও প্রতীকতা পেয়েছে—'উন্মাদের মতো, ভিক্ষুকের মতো তারা চীৎকার করছে। তারা এবং সেই মাহাতো বুড়ো'—সবাই মিলে আত্মসম্মান হারিয়ে ভিখারিতে পরিণত হয়েছে। শ্রমজীবী কৃষকের ভিক্ষুকে পরিণত হওয়া—এই হলো ঔপনিবেশিক শাসনে বিক্ষত ভারতবর্ষের অমোঘ নিয়তি। যারা রৌদ্রে পুড়ে জলে ভিজে শাসন শোষণ অত্যাচার উপেক্ষা করে অন্ন তুলে দিত সকলের মুখে, তারাই এখন স্বাধীনবৃত্তির গৌরব হারিয়ে অন্নদাস ভিখারিতে পরিণত হয়েছে। একটা জাতির চারিত্রিক মানসিক স্বাধীনবৃত্তির আমূল করুণ পরিবর্তনের ছবি এঁকেছেন লেখক। যাদের নিয়ে ভারতবর্ষের আকাশ-বাতাস-মাটি-প্রান্তর ফসলের মাঠ গর্বিত ছিল তারাই গর্বের গিরিচূড়া থেকে চূড়ান্ত পতন ঘটিয়ে দাসত্বের ভিক্ষুকবৃত্তিকে স্বীকার করে ভারতবর্ষের সার্বিক রূপান্তর ঘটিয়েছে—জ্বালা ক্ষোভ তীর্যক ব্যঙ্গ বেদনায় এই চরম সত্য উচ্চারিত হয়েছে 'ভারতবর্ষ' নামকরণে।

ছোটগল্পের শৈল্পিক সংগঠনেই একটা গল্পের সার্থকতা নির্ভর করে। ভালো ছোটগল্প আকারে ক্ষুদ্র, ভাবগভীরতায় অখন্ড উদ্ভাস ঘটায়। আঁটোসাঁটো গঠনে সূক্ষ্মব্যঞ্জনা প্রতীকী তাৎপর্য সৃষ্টি করে ভালো ছোটগল্প। সেখানে থাকে গল্পকারের অন্তরঙ্গ গভীর নির্জন কণ্ঠস্বর। 'নির্জন' এই অর্থে যে সে স্বর তাঁর একান্ত নিজস্ব বোধ ও অনুভূতি থেকে জাত। সবমিলিয়ে ভালো ছোটগল্প দক্ষ শিল্পীর সুন্দরতম অনুভবের সার্থক প্রকাশ। আলোচ্য গল্পে রমাপদ চৌধুরীর শিল্পীমনের মৌলিকতার সুন্দরতম প্রকাশ ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালকে পটভূমি করে ঐ সময়ের মর্মভেদী যন্ত্রণাকে তিনি আবিষ্কার করেছেন তাঁর অন্তরঙ্গ নিজস্ব নির্জনভঙ্গিতে। টুকরো টুকরো ঘটনাগুলিকে ভাবঐক্যে সুগ্রথিত করে তাঁর বেদনাবোধ ও ইতিহাসচেতনাকে বাঙ্ময় শিল্পরূপ দান করেছেন। মরমী পাঠকের মনে গল্পপাঠ শেষে ঘনীভূত বেদনার শিল্পবাণী বৃহত্তর ভাব ব্যঞ্জনা জাগায়।

একটি খণ্ডিত অংশ বেছে নিয়ে গল্পকার দেখালেন হল্ট স্টেশন কিভাবে তৈরী হলো; কারা কখন সেখানে আসত, তাদের দু একটি কথা, হাঁটা চলায় তাদের স্বভাব বৈশিষ্ট এঁকে সীমার মধ্যে চূড়ান্তের বিস্ময় বেদনাকে স্থাপন করেছেন। হল্ট স্টেশনের অদূরে মাহাতো গ্রাম;

drive.google.com

বুড়োই যেন তার গ্রামের মানুষের ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ। কিন্তু আত্মসম্মানের এই শেষ অবলম্বনে মাহাতো বুড়োও একদিন গড্ডলিকা স্রোতে মিশে গেল। সেও সেদিন ট্রেন ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অন্যসব মাহাতো নারীপুরুষের সঙ্গে সমস্বরে চীৎকার করে বলতে লাগল 'সাব বখ্‌শিস, সাব বখ্‌শিস! উন্মাদের মতো, ভিক্ষুকের মতো তারা চিৎকার করছে। তারা এবং সেই মাহাতো বুড়ো।'

হল্ট স্টেশনে আর ট্রেন থামবে না। যুদ্ধ শেষ, সৈন্যদলের গলায় মুক্তির গান। ট্রেন ভর্তি সৈনিক গান গাইতে গাইতে চলে গেল। কিন্তু যে মাহাতোরা ক্ষেতের কাজে, নিজস্ব জীবন যাত্রায় ছিল স্বাধীন, অবাধ মুক্ত আনন্দের অধিকারী, তারা সবাই পাল্টে গেল। ক্ষেতের চাষ করত ঘাম ঝরিয়ে; ফসল ফলাতো অবাধ আনন্দে, তারা সবাই এখন ভিখিরি হয়ে গেল। খেটে খাওয়া শ্রমজীবী কর্মহীন হয়ে ভিক্ষুকে পরিণত হল। আত্মসম্মান বিকিয়ে 'ব্লাডি বেগার্স' রূপে করুণা ভিক্ষার হীনতার বেদনায় নিঃশেষিত, এখানেই গল্পটি শেষ হয়েছে।

এ গল্পের ছত্রে ছত্রে লেখকের দেশপ্রেম প্রচ্ছন্ন আছে। গল্পের কথক ঠিকাদার, ভগোতীলাল আর জানকীনাথ যেন এ দেশীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি, যারা ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থায় আত্মঅবমাননার যন্ত্রণায় বিদীর্ণ হয় আবার নিজেদের কাজের দ্বারা পরোক্ষে আত্মঅবমাননার পথ তৈরী করে—এই দ্বন্দ্ব তীব্র তীর্যক বাক্যে বারবার স্পষ্ট হয়েছে। ঠিকাদার কথক মিলিটারি সৈন্যদের ব্রেকফাস্টের তদারকিতে শশব্যস্ত, সাপ্লাই ফর্ম মেজরকে দিয়ে ও. কে করানোর জন্য তৎপর হতেন। সুযোগ পেলেই হেসে হেসে মেজরকে তোয়াজ করতেন পরের দিনের ব্রেকফাস্টের কন্ট্রাক্ট পাবার জন্য। আবার এই ঠিকাদার কথক যখন একজন সৈনিককে দাঁড়িয়ে থাকা মাহাতোদের সম্বন্ধে 'অফুল' বলতে শোনেন তখন মর্মাহত হন্নেন। ঠিকাদারই একদিন মাহাতোদের উদ্দেশে সৈনিকদের ছুঁড়ে দেওয়া পয়সা কুড়িয়ে তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আবার এই চরিত্রকেই মাহাতোদের ভিক্ষাবৃত্তি করতে দেখে কুণ্ঠিত হতে দেখা গিয়েছে। অধীনতাস্বীকার ও মুক্তির দ্বন্দ্ব নিঃসন্দেহে মধ্যবিত্ত মানসিকতার দ্বন্দ্ব। যেদিন মার্কিন অফিসার কালো কালো নেংটি পরা মাহাতোদের উদ্দেশে 'ব্লাডি বের্গাস' কথাটি বলেছিল সেদিন কথক নিজেকে চরম অপমানিত বলে মনে করেছিলেন—'আমি আর জানকীনাথ পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম। আমাদের মুখ অপমানে কালো হয়ে গেল। মাথা তুলে তাকাতে পারলাম না। শুধু আমি রাগে ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠলাম।' এ অপমান একজন ভারতবাসীরূপে। শাসকশ্রেণীর শোষণ অবজ্ঞা যেন 'ব্লাডি বের্গাস' কথাটায় নির্মম আঘাত সৃষ্টি করেছে। সৈন্যদের পয়সা ছুঁড়ে দেওয়া আর মাহাতোদের পয়সা কুড়িয়ে নেওয়া কথকের মনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। অস্তিত্ব যে বিপন্ন এ বোধ এগল্পে কথকের মানসিক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর মনে উনিশ শতক থেকেই যে দ্বন্দ্ব অবিরত দানা বেঁধে চলেছে তারই যন্ত্রণাময় প্রকাশ ঘটেছে এই গল্পে।

'ভারতবর্ষ' নামটি ব্যঞ্জনাময়। ভারতবর্ষ থমকে আছে কাঁটাতারের ওপারে সমবেত মাহাতো নারীপুরুষের ভীড়ে। তাদের সমুচ্চ কণ্ঠস্বরের আর্বৃত্তিতে উচ্চারিত হয়েছে ভারতবর্ষের

4G 44% 9:05 p.m.
drive.google.com

করেছে। কিভাবে কবে থেকে তিলে তিলে সব হারানো, সব খোয়ানোর পালা শুরু হয়েছিল তার উৎস খুঁজতে খুঁজতেই তিনি সদ্য পার হয়ে আসা মহাযুদ্ধ প্রভাবিত সময়কালকেই উপযুক্ত মনে করে সেখানেই এসে দাঁড়িয়েছেন। বর্তমান সময়ের অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সদ্যঅতীতকেই খুঁড়ে তার গভীর তলদেশকে দেখতে চেষ্টা করেছেন। সে কারণেই গল্পের কথক রূপে বেছে নিয়েছেন ঠিকাদার চরিত্রকে যিনি আমি অর্থাৎ উত্তমপুরুষের বচনে এই পরিণতির কথা; ভারতবর্ষের রূপান্তরিত চেহারাটা বর্ণনা করেছেন। এই উত্তমপুরুষই একদিন মাহাতো ছেলেমেয়েকে শিখিয়েছিলেন ঔপনিবেশিক আনুগত্য, দাক্ষিণ্য কিভাবে গ্রহণ করতে হয়। তিনিই বলেছিলেন 'সাহেব বখশিস দিয়েছে; বখশিস তুলেনে'। তিনিই চকচকে আধুলি, টাকা কুড়িয়ে মাহাতোদের হাতে দয়ার দান তুলে দিয়েছেন। উপনিবেশবাদের আনুগত্য-শিখিয়েছিলেন যিনি, তিনিই গল্পের শেষে মানুষগুলিকে ভিখিরিতে পরিণত হতে দেখে সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা পেয়েছেন। মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের দ্বন্দ্ব আর সুগভীর ট্র্যাজেডিই এ গল্পের পরিণাম নির্দেশিত করছে। এটাই হলো ভারবর্ষের ইতিহাসের ট্র্যাজেডি। চরম নৈতিক বিপর্যয়ের জন্য কে বা কারা দায়ী এই গভীর সত্যই উচ্চারিত হয়েছে গল্পের শেষবাক্যে। গল্পটির চূড়ান্ত বক্তব্য ও উপস্থাপনা অনবদ্য।

নাম নেই, পরিচয় নেই, চাকচিক্য কিছুই নেই-এমন একটা অখ্যাত জায়গায় ট্রেন বোঝাই করে আসাযাওয়ার পথে দুদন্ড থামত, চা ব্রেকফাস্ট খেত আমেরিকান সৈন্যদল অথবা ইটালিয়ান যুদ্ধবন্দীর দল। এটা কোনো স্টেশন বা জংশন স্টেশন নয়। ফৌজী সংকেতে জায়গাটা বি.এফ.থ্রি-থার্টি-টু নামে চিহ্নিত হত। প্ল্যাটফর্ম, টিকিটঘর যাত্রী ট্রেন থামা-ওঠা কোনটাই এখানেই হয় না। কোনো আপ ডাউন ট্রেন কিছুই দাঁড়ায় না, শুধু সৈনিকে বোঝাই ট্রেন হঠাৎ হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য থামত ব্রেকফাস্ট নেবার জন্য। গল্পের কথক ঠিকাদার, কুক বিহারী ভগোতীলাল জানত ট্রেন থামবে; তাই তারা সৈনিকদের জন্য ডিমসেদ্ধ পাঁউরুটি আর কফি বানিয়ে ব্রেকফাস্ট প্রস্তুত করে রাখত। জায়গাটায় ব্রেকফাস্টের ডিমের খোলা জমতে জমতে একদিন নাম হয়ে গেল 'আন্ডাহল্ট'। আর কিছু দিনের মধ্যেই জায়গাটা কাঁটাতারে ঘেরা দিয়ে মোরাম দিয়ে উঁচু করা প্ল্যাটফর্মের চেহারা নিল। রাতারাতি জায়গাটা জমে উঠল। বন্দীদল ছাড়াও মিলিটারি স্পেশাল দাঁড়াতে লাগল। গ্যাবার্ডিনের প্যান্ট, হিপপকেটে টাকার ব্যাগ গোঁজা আমেরিকান মিলিটারি সৈন্যরা ট্রেন থেকে নেমে পাইচারি করত, ঠাট্টা হাসিতে হল্ট স্টেশন সরগরম করত, আবার চলে যেত।

হল্টের অদূরে ছোট বেঁটে খাটো পাহাড়ী টিলার নীচে মাহাতোদের গ্রাম। হাঁস মুরগী পালত মাহাতোরা, হাটে হাটে মুরগীর ডিম বেচত, ক্ষেতিতে কাজ করত। এরা দূর থেকে মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে ট্রেনের আসা যাওয়া দেখত অবাক চোখে। ঠিকাদার কথকের কথায় জানা যায়---'ওরা তো দিব্যি ক্ষেতে খামারে কাজ করে, গুলতি নয়তো তীরধনুক নিয়ে খটাস মারে, নাচুয়া গান শোনে, হাঁড়িয়া খায়, ধনুকের ছিলার মতো কখনো কখনো টানটান হয়ে রুখে দাঁড়ায়।' মাহাতো গ্রামের ছেলে-বুড়ো-যুবা নিজেদের সবল জীবন ছন্দের বহমানতায় নিজেদের মতো বেড়ে উঠেছিল। এদের জীবনযাত্রায় ছিল প্রাকৃতিক জীবনের স্বাভাবিকতা। কিন্তু হল্ট স্টেশন ক্রমে ক্রমে তাদের বদলে দিল। এরা দূর থেকে সোৎসাহে দাঁড়িয়ে ট্রেন